"গোধূলি বেলায় নতুন আলো"

*******দেবানন্দ*******

দক্ষিণ কলকাতার এক অভিজাত আবাসনের চারতলার ফ্ল্যাটটির বারান্দায় দাঁড়িয়ে অরিন্দম এক কাপ ধোঁয়া ওঠা চায়ের মগ হাতে নিচের ব্যস্ত শহরের দিকে তাকিয়ে ছিল। বাতাসে হেমন্তের হালকা শিরশিরানি। অরিন্দমের বয়স তখন বিয়াল্লিশের কোঠায়। সরকারি দপ্তরের একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক হিসেবে তার যেমন সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল, তেমনই ব্যক্তিগত জীবনেও ছিল পরিপূর্ণ সুখ। তার স্ত্রী সুচিত্রা ছিল তার জীবনের ধ্রুবতারা–শান্ত, স্নিগ্ধ এবং অসম্ভব গোছানো একজন মানুষ। আর তাদের একমাত্র সন্তান ঋত্বিক, যে তখন ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র, পড়াশোনায় মেধাবী এবং স্বভাবে মায়ের মতোই নম্র।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও সকালটা শুরু হয়েছিল সুচিত্রার চেনা ব্যস্ততায়। ঋত্বিকের স্কুলের টিফিন গুছিয়ে দেওয়া, অরিন্দমের অফিসের ফাইল আর চশমাটা হাতের কাছে এগিয়ে দেওয়া–সবই চলছিল ঘড়ির কাঁটা মেনে। বিকেলে সুচিত্রার যাওয়ার কথা ছিল তার এক পুরনো বান্ধবীর মেয়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। যাওয়ার আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নীল রঙের একটি তসর শাড়ি পরে অরিন্দমকে জিজ্ঞেস করেছিল, "কেমন লাগছে গো? অনেকদিন পর পরলাম শাড়িটা।"

অরিন্দম হেসে বলেছিল, "তোমাকে তো সব রঙেই মানায় সুচিত্রা। তাড়াতাড়ি ফিরো, রাতে ঋত্বিক চাইনিজ খেতে চেয়েছে।"

কিন্তু সেই রাত আর আসেনি। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ অরিন্দমের ফোনে একটি অচেনা নম্বর থেকে কল আসে। ওপাশ থেকে এক পুলিশ অফিসারের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে–গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে একটি বেপরোয়া লরির ধাক্কায় সুচিত্রার অটোটি দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই সব শেষ।

মুহূর্তের মধ্যে অরিন্দমের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছিল। পনেরো বছরের সাজানো সংসার, হাসি-কান্না, ভবিষ্যতের হাজারো পরিকল্পনা–সব যেন এক নিমেষে ছাই হয়ে গেল। মর্গের ঠান্ডা ঘরে যখন সুচিত্রার নিথর দেহটা দেখল, অরিন্দম চিৎকার করে কাঁদতেও পারেনি। তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ষোলো বছরের ঋত্বিক পাথরের মূর্তির মতো জমে গিয়েছিল। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলেটা শুধু ফিসফিস করে বলেছিল, "বাবা, মা তো বলল রাতে তাড়াতাড়ি ফিরবে!"

সুচিত্রার শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাওয়ার পর ফ্ল্যাটটা যেন এক নিঃস্তব্ধ সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হলো। দেওয়ালের প্রতিটি কোণে, বসার ঘরের সোফায়, রান্নাঘরের মশলার কৌটোয়–সর্বত্র সুচিত্রার স্পর্শ লেগে আছে। অরিন্দম অফিস থেকে ফিরে দরজা খুললেই যেন শুনতে পেত সুচিত্রার পায়ের আওয়াজ। কিন্তু পরক্ষণেই বাস্তবের রূঢ় আঘাতে বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠত।

ঋত্বিকের সামনে অরিন্দম নিজেকে শক্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করত। ক্লাস ইলেভেনের পড়াশোনার চাপ, সামনেই জয়েন্ট এন্ট্রান্সের প্রস্তুতি–এই বয়সে মায়ের অভাব ছেলেটার ভবিষ্যৎ যাতে নষ্ট না করে, সেটাই ছিল অরিন্দমের একমাত্র চিন্তা। বাপ-বেটার এই নতুন সংসার শুরু হলো। সকালে উঠে অরিন্দম নিজেই রান্নাঘরে ঢুকত। কখনো ডাল-ভাত, কখনো রুটি-তরকারি। কাজের মাসি সবিতা দিদি থাকলেও ছেলের পছন্দের খাবারগুলো অরিন্দম নিজের হাতেই বানাত। রাতে খাওয়ার পর ঋত্বিক যখন পড়তে বসত, অরিন্দম বারান্দায় বসে একাকীত্বের অন্ধকারের সাথে লড়াই করত। দিনগুলো কাটছিল এক যান্ত্রিক নিয়মে, যেখানে কোনো রঙ ছিল না, ছিল কেবল দায়িত্ব আর স্মৃতির বোঝা।

প্রায় এক বছর কেটে গেল। ঋত্বিক তখন ক্লাস টুয়েলভে উঠেছে। জীবনের গতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও শূন্যতাটা কাটেনি। এমনই এক রবিবারের বিকেলে ফ্ল্যাটের কলিং বেল বেজে উঠল। অরিন্দম দরজা খুলে দেখল, বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন মৈত্রেয়ী। সুচিত্রার কলেজের সবচেয়ে কাছের বান্ধবী। সুচিত্রার মৃত্যুর সময় মৈত্রেয়ী দিল্লিতে ছিলেন, তাই আসতে পারেননি। সম্প্রতি বদলি হয়ে কলকাতায় এসেছেন।

মৈত্রেয়ীও একজন সরকারি চাকুরিজীবী, শিক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক। তার জীবনটাও কম ঝড়ঝাপটার নয়। বছর পাঁচেক আগে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে মৈত্রেয়ী তার স্বামীকে হারিয়েছেন। তার একমাত্র ছেলে অনিরুদ্ধ সদ্য ক্লাস টুয়েলভ পাশ করে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে।

বসার ঘরে বসে মৈত্রেয়ী যখন সুচিত্রার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অশ্রুসজল চোখে তাকালেন, অরিন্দমের বুকের ভেতরটা আবার ভারী হয়ে উঠল। মৈত্রেয়ী বললেন, "সুচিত্রা আমাকে ফোনে প্রায়ই তোমাদের কথা বলত অরিন্দম দা। ও চলে যাওয়ার পর তোমরা কীভাবে আছ, তা ভেবে আমার খুব কষ্ট হতো। কলকাতায় বদলি হয়েই তাই সবার আগে ছুটে এলাম।"

সেদিন বিকেলে মৈত্রেয়ী অনেকক্ষণ ছিলেন। ঋত্বিকের সাথে কথা বললেন, তার পড়াশোনার খোঁজ নিলেন। যাওয়ার আগে অরিন্দমকে বললেন, "নিজেকে এভাবে গুটিয়ে রাখবেন না অরিন্দম দা। ঋত্বিকের জন্য হলেও আপনাকে ভালো থাকতে হবে। কোনো প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবেন, আমি তো পাশের পাড়াতেই থাকি।"

এরপর থেকে মৈত্রেয়ীর যাতায়াত বাড়ল। ছুটির দিনে তিনি কখনো ঋত্বিকের জন্য নিজের হাতে বানানো পায়েস নিয়ে আসতেন, কখনো বা অরিন্দমের সংসারের টুকিটাকি অব্যবস্থাগুলো গুছিয়ে দিতেন। অরিন্দমও মাঝে মাঝে মৈত্রেয়ীর ফ্ল্যাটে যেত। অনিরুদ্ধর সাথে ঋত্বিকের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। অনিরুদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র হওয়ায় ঋত্বিককে ফিজিক্স আর অঙ্কের নানা জটিল বিষয় বুঝিয়ে দিত। দুটি ভাঙা পরিবার যেন একে অপরের আশ্রয় হয়ে উঠল।

ধীরে ধীরে অরিন্দম লক্ষ্য করল, মৈত্রেয়ীর উপস্থিতিতে তার দীর্ঘদিনের নিঃসঙ্গতা অনেকটা হালকা হয়ে আসছে। অফিসের ক্লান্তির পর মৈত্রেয়ীর সাথে ফোনে কথা বলতে তার ভালো লাগত। মৈত্রেয়ীও যেন তার একাকী জীবনের কথাগুলো অরিন্দমের কাছে উজাড় করে দিতে পারতেন। দুজনেই সমবয়সী, দুজনেই একই পেশাগত জগতের মানুষ, এবং সবচেয়ে বড় কথা–দুজনেই প্রিয়জন হারানোর গভীর যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছেন।

এক বর্ষার সন্ধ্যায়, প্রবল বৃষ্টিতে কলকাতার রাস্তাঘাট জলমগ্ন। অরিন্দম অফিস থেকে ফেরার পথে মৈত্রেয়ীর ফ্ল্যাটে আটকে পড়ল। অনিরুদ্ধ সেদিন হস্টেলে ছিল। বারান্দায় বসে বৃষ্টির ছাঁট গায়ে মেখে দুজনে কফি খাচ্ছিল। কথার ফাঁকে মৈত্রেয়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "জানেন অরিন্দম দা, অনিরুদ্ধ বড় হয়ে যাচ্ছে। আর দু-তিন বছর পর ও হয়তো চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যাবে। তখন এই বিশাল ফ্ল্যাটটা আমাকে গিলে খেতে আসবে। একাকীত্ব যে কতটা ভয়ঙ্কর, তা কেবল আমরাই বুঝি।"

অরিন্দম মৈত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকাল। ল্যাম্পপোস্টের আবছা আলোয় মৈত্রেয়ীর স্নিগ্ধ মুখশ্রীতে এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা আর মায়া। অরিন্দম নিজের অজান্তেই মৈত্রেয়ীর হাতের ওপর নিজের হাতটা রাখল। বলল, "আমরা কি পারি না মৈত্রেয়ী, জীবনের বাকি পথটা একে অপরের হাত ধরে হাঁটতে? সুচিত্রা বা তোমার স্বামীর জায়গা কেউ নিতে পারবে না, কিন্তু আমরা তো একে অপরের ভালো বন্ধু আর জীবনসঙ্গী হতে পারি।"

মৈত্রেয়ী চমকে উঠে অরিন্দমের দিকে তাকালেন। তার চোখে জল চিকচিক করছিল, কিন্তু ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল এক প্রশান্তির হাসি। তিনি হাতটা সরিয়ে নিলেন না, বরং আলতো করে অরিন্দমের আঙুলগুলো স্পর্শ করলেন। সেদিন কোনো শব্দ ছাড়াই দুটি একাকী হৃদয়ের মধ্যে এক নতুন সম্পর্কের সূচনা হলো।

পরবর্তী এক বছর ছিল তাদের জীবনের এক নতুন বসন্ত। সমাজের চোখ এড়িয়ে, নিজেদের কাজের ব্যস্ততার ফাঁকে তারা একে অপরের জন্য সময় বের করত। কখনো ভিক্টোরিয়ার সবুজ ঘাসে বসে গল্প করা, কখনো বা নন্দনে কোনো সিনেমা দেখা। তাদের এই ভালোবাসা ছিল না কোনো উচ্ছল কিশোর-কিশোরীর প্রেম; এ ছিল দুটি পরিণত মানুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, নির্ভরতা এবং মানসিক আশ্রয়ের সম্পর্ক। অরিন্দম আবার নতুন করে বাঁচতে শুরু করেছিল, আর মৈত্রেয়ী খুঁজে পেয়েছিলেন তার হারানো হাসি।

কিন্তু সুখ বোধহয় চিরস্থায়ী হয় না। তাদের এই সম্পর্কের কথা ধীরে ধীরে দুই পরিবারের কানে পৌঁছাতে শুরু করল। আর সেখান থেকেই শুরু হলো প্রবল ঝড়।

অরিন্দমের বাবা-মা থাকতেন বর্ধমানের পৈতৃক বাড়িতে। অরিন্দমের ছোট বোন রূপা, যে কলকাতারই বাসিন্দা, সে প্রথম এই বিষয়টি জানতে পারে। একদিন রূপা অরিন্দমের ফ্ল্যাটে এসে সরাসরি প্রশ্ন করল, "দাদা, আমি যা শুনছি তা কি সত্যি? তুমি নাকি সুচিত্রা বৌদির বান্ধবী মৈত্রেয়ী দিকে বিয়ে করার কথা ভাবছ?"

অরিন্দম শান্তভাবে উত্তর দিল, "হ্যাঁ রূপা। আমি আর মৈত্রেয়ী দুজনেই খুব একা। ঋত্বিক আর অনিরুদ্ধ বড় হয়ে গেলে আমাদের পাশে থাকার কেউ থাকবে না। আমরা দুজনেই নিজেদের মতো করে বাকি জীবনটা কাটাতে চাই।"

রূপা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। "তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে দাদা! এই বয়সে বিয়ে? লোকে কী বলবে ভেবেছ? বাবা-মা শুনলে তো হার্টফেল করবেন। আর ঋত্বিক? ওর সামনেই পরীক্ষা, ও কী ভাববে? বৌদি মারা যাওয়ার দু-বছরও হয়নি, আর তুমি অন্য মহিলার সাথে ঘুরছ!"

অরিন্দম বোঝানোর চেষ্টা করল, "রূপা, তুমি ব্যাপারটা ভুল বুঝছ। সুচিত্রার প্রতি আমার ভালোবাসা কখনো কমবে না। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য মানুষের একজন সঙ্গীর প্রয়োজন হয়।"

"কোনো প্রয়োজন হয় না," রূপা চিৎকার করে উঠল। "তুমি যদি এই বিয়ে করো, তবে আমাদের পরিবারের সাথে তোমার সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে।"

অন্যদিকে, মৈত্রেয়ীর পরিবারেও একই রকমের অশান্তি শুরু হলো। মৈত্রেয়ীর দাদা এবং বৌদি তাকে রীতিমতো অপমান করলেন। মৈত্রেয়ীর দাদা বললেন, "তোর লজ্জা করে না মৈত্রেয়ী? ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, আর তুই এই বয়সে প্রেম করছিস? আমাদের বংশের সম্মান তুই ধুলোয় মিশিয়ে দিবি?" মৈত্রেয়ীর মৃত স্বামীর বাড়ির লোকেরাও ফোন করে তাকে নানা কটু কথা শোনাতে লাগল। এমনকি তারা হুমকি দিল যে, মৈত্রেয়ী যদি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন, তবে তার স্বামীর পেনশন এবং সম্পত্তির ওপর থেকে তার অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য তারা আইনি লড়াই করবে।

সবচেয়ে বড় আঘাত এল দুই ছেলের দিক থেকে। ঋত্বিক তখন জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাড়ির এই অশান্তি, পিসির চিৎকার-চেঁচামেচি এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের কানাঘুষো তার কিশোর মনে গভীর প্রভাব ফেলল। সে বাবার ওপর সরাসরি রাগ না দেখালেও, নিজেকে একদম গুটিয়ে নিল। বাবার সাথে কথা বলা কমিয়ে দিল, খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল। একদিন রাতে অরিন্দম ঋত্বিকের ঘরে গিয়ে দেখল, ছেলেটা পড়ার টেবিলে মাথা রেখে নিঃশব্দে কাঁদছে। অরিন্দম মাথায় হাত রাখতেই ঋত্বিক ছিটকে সরে গেল। ধরা গলায় বলল, "বাবা, তুমি কি সত্যিই মায়ের জায়গাটা অন্য কাউকে দিয়ে দেবে? আমি কি তোমার জন্য যথেষ্ট নই?"

ঋত্বিকের এই কথায় অরিন্দমের বুকটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সে নিজেকে খুব স্বার্থপর মনে করতে লাগল।

ওদিকে অনিরুদ্ধর অবস্থাও তথৈবচ। কলেজে বন্ধুদের সামনে সে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছিল না। মায়ের এই সম্পর্কের কথা জানার পর সে হস্টেল থেকে বাড়ি আসা বন্ধ করে দিল। মৈত্রেয়ী ফোন করলে সে রূঢ়ভাবে কথা বলত। একদিন অনিরুদ্ধ মাকে সাফ জানিয়ে দিল, "মা, তুমি যদি ওই লোকটাকে বিয়ে করো, তবে আমি আর কোনোদিন এই বাড়িতে পা রাখব না। তোমার যা ইচ্ছে করো।"

দুই পরিবারের এই প্রবল চাপ, আত্মীয়দের কটাক্ষ এবং সবচেয়ে বড় কথা–নিজেদের সন্তানের চোখের জল অরিন্দম ও মৈত্রেয়ীকে এক কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল।

এক সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সরোবরের নির্জন বেঞ্চে বসে দুজনে মুখোমুখি হলো। দুজনের চোখেই ক্লান্তি আর গভীর বিষাদ। মৈত্রেয়ী দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন, "অরিন্দম দা, আমরা বোধহয় একটু বেশিই স্বপ্ন দেখে ফেলেছিলাম। আমাদের এই সমাজ এখনো এতটা উদার হয়নি যে, দুজন মধ্যবয়সী মানুষের একাকীত্বকে সম্মান জানাবে।"

অরিন্দম আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "সমাজের কথা আমি ভাবি না মৈত্রেয়ী। কিন্তু ঋত্বিক আর অনিরুদ্ধ? ওদের মুখের দিকে তাকালে আমি আর নিজের সুখের কথা ভাবতে পারছি না। ওরা এখনো অনেক ছোট, জীবনের বাস্তবতা বোঝার মতো পরিণত ওরা হয়নি। আমাদের এই সিদ্ধান্তের জন্য ওদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হোক, তা আমি কোনোভাবেই চাই না।"

মৈত্রেয়ীর চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তিনি বললেন, "আমিও ঠিক সেটাই ভাবছি। অনিরুদ্ধ আমার সব। ওকে হারিয়ে আমি কোনোদিন সুখী হতে পারব না। তাহলে কি আমাদের পথ এখানেই আলাদা হয়ে যাবে অরিন্দম দা?"

অরিন্দম মৈত্রেয়ীর হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোয় নিল। দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "না মৈত্রেয়ী, পথ আলাদা হবে না। আমরা বিয়ে করব না, এক ছাদের নিচেও থাকব না। কিন্তু আমাদের এই বন্ধুত্ব, এই ভালোবাসা চিরকাল থাকবে। আমরা দুজনেই সরকারি চাকরি করি, নিজেদের মতো করে ব্যস্ত থাকব। দূর থেকেই একে অপরের খবর রাখব, পাশে থাকব। যদি কোনোদিন সময় বদলায়, যদি আমাদের সন্তানেরা বড় হয়ে আমাদের এই একাকীত্বটা বুঝতে পারে, তবে সেদিন না হয় নতুন করে ভাবা যাবে। আর তা না হলেও, এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসাই আমাদের বেঁচে থাকার শক্তি জোগাবে।"

সেদিন তারা এক কঠিন ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিল। নিজেদের সুখকে জলাঞ্জলি দিয়ে তারা বেছে নিল সন্তানদের ভবিষ্যৎ এবং পারিবারিক শান্তি। এরপর থেকে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে গেল। কেবল বিশেষ কোনো দিনে বা বিপদে-আপদে ফোনে সংক্ষিপ্ত কুশল বিনিময় হতো। সমাজ ও পরিবারের চোখে সব আবার 'স্বাভাবিক' হয়ে গেল।

সময় কারো জন্য থেমে থাকে না। নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলল বছরগুলো।

ঋত্বিক জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ভালো ফল করে খড়গপুর আইআইটি-তে সুযোগ পেল। ছেলেকে হস্টেলে রেখে আসার দিন অরিন্দম খুব কেঁদেছিল। ফ্ল্যাটটা আবার সেই আগের মতো নিঃস্তব্ধ হয়ে গেল। অরিন্দম নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অফিসের কাজে ডুবিয়ে দিল। পদোন্নতি হয়ে সে এখন দপ্তরের যুগ্ম সচিব। চুলে পাক ধরেছে, চোখের কোণে বলিরেখা স্পষ্ট।

অন্যদিকে, অনিরুদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বেঙ্গালুরুর এক বহুজাতিক সংস্থায় মোটা বেতনের চাকরি পেল। মৈত্রেয়ীও এখন শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা। তিনিও তার বিশাল ফ্ল্যাটে একাকী দিন কাটাতে লাগলেন। মাঝে মাঝে যখন একাকীত্ব অসহ্য হয়ে উঠত, তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে অরিন্দমের কথা ভাবতেন। অরিন্দমও তার ব্যস্ততার ফাঁকে মৈত্রেয়ীর কথা মনে করত, কিন্তু দুজনেই তাদের প্রতিজ্ঞায় অটল ছিল। দীর্ঘ আট বছর তারা এভাবেই দূরত্ব বজায় রেখে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে গেল।

দেখতে দেখতে ঋত্বিকও পড়াশোনা শেষ করে আমেরিকায় পাড়ি দিল। সেখানেই একটি নামী সংস্থায় সে কর্মরত। বছর দুয়েক পর ঋত্বিক তার পছন্দের একটি বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিল। মেয়েটিও আমেরিকাতেই থাকে। কলকাতায় এসে ধুমধাম করে ঋত্বিকের বিয়ে হলো। অরিন্দম বাবার সব দায়িত্ব পালন করল। বৌভাতের দিন আত্মীয়-স্বজনে বাড়ি গমগম করছিল, কিন্তু অরিন্দম অনুভব করছিল এক গভীর শূন্যতা। বিয়ের মাসখানেক পর ঋত্বিক তার স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকায় ফিরে গেল।

এর ঠিক ছয় মাস পর অনিরুদ্ধরও বিয়ে ঠিক হলো। পাত্রী অনিরুদ্ধরই সহকর্মী। মৈত্রেয়ী একাই সমস্ত আয়োজন সামলে ছেলের বিয়ে দিলেন। অরিন্দম সেই বিয়েতে গিয়েছিল, তবে একজন সাধারণ অতিথির মতো। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দুজনে চোখাচোখি হয়েছিল, কিন্তু কথা বলার সুযোগ হয়নি। বিয়ের পর অনিরুদ্ধও তার স্ত্রীকে নিয়ে বেঙ্গালুরুতে সংসার পাতল।

এখন অরিন্দম এবং মৈত্রেয়ী দুজনেই অবসরের দোরগোড়ায়। দুজনেরই সংসারের সমস্ত দায়িত্ব শেষ। সন্তানেরা তাদের নিজেদের জীবনে সুখী এবং প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই দুই প্রবীণ মানুষের জীবনে নেমে এল এক অন্তহীন শূন্যতা।

একদিন আমেরিকা থেকে ঋত্বিক অরিন্দমকে ভিডিও কল করল। ঋত্বিকের স্ত্রী তখন অফিসের কাজে ব্যস্ত। ঋত্বিক বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবা, তোমার শরীরটা কি খারাপ? মুখটা এত শুকনো লাগছে কেন? তুমি কি ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করছ?"

অরিন্দম হেসে বলল, "না রে বাবা, আমি একদম ঠিক আছি। বয়স হচ্ছে তো, তাই একটু ক্লান্ত লাগে।"

ঋত্বিক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "বাবা, আজ আমি নিজে সংসার করছি। আমি বুঝি, দিনের শেষে বাড়ি ফিরে মনের কথা বলার মতো একজন মানুষের থাকাটা কতটা জরুরি। আট বছর আগে আমি খুব ছোট ছিলাম, স্বার্থপরের মতো তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। আজ আমি তোমার সেই একাকীত্বটা অনুভব করতে পারি বাবা। তুমি কি এখনো মৈত্রেয়ী মাসির সাথে যোগাযোগ রাখো?"

অরিন্দম চমকে উঠল। সে কোনো উত্তর দিতে পারল না, শুধু চোখ দুটো জলে ভরে এল।

ঋত্বিক বলল, "বাবা, আমি চাই না তুমি এভাবে একা একা জীবনটা কাটাও। তুমি মৈত্রেয়ী মাসির সাথে কথা বলো। তোমাদের বাকি জীবনটা অন্তত নিজেদের মতো করে বাঁচো। আমি আর অনিরুদ্ধ–আমরা দুজনেই তোমাদের পাশে আছি।"

আশ্চর্যের বিষয়, ঠিক সেই সময়েই বেঙ্গালুরুতে বসে অনিরুদ্ধও তার মায়ের সাথে একই কথা বলছিল। সংসার জীবনে প্রবেশ করার পর অনিরুদ্ধ উপলব্ধি করেছিল, তার মা কতটা ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সে মৈত্রেয়ীকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, "মা, আমাকে ক্ষমা করে দিও। সেদিন আমার অহংকার আর অজ্ঞতার জন্য তোমার জীবন থেকে অনেকগুলো বছর কেড়ে নিয়েছিলাম। আর নয় মা, এবার তুমি নিজের কথা ভাবো।"

পরদিন বিকেলে দক্ষিণ কলকাতার সেই পুরনো লেকের ধারে, যেখানে আট বছর আগে তারা আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেখানেই আবার মুখোমুখি হলো অরিন্দম ও মৈত্রেয়ী। বিকেলের গোধূলির কমলা আলো এসে পড়েছে লেকের জলে। বাতাসে শিরশিরানি, ঠিক সেই প্রথম দিনের মতো।

অরিন্দমের চুলে রুপোলি আভা, মৈত্রেয়ীর কপালে চিন্তার ভাঁজ, কিন্তু দুজনের চোখেই আজ এক অদ্ভুত প্রশান্তি। অরিন্দম মৈত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, "অনেকটা সময় পেরিয়ে এল, তাই না মৈত্রেয়ী? আমাদের জীবনের দুপুরটা শেষ হয়ে এখন বিকেল নেমেছে।"

মৈত্রেয়ী চোখের কোণের জল মুছে হাসলেন। বললেন, "বিকেল হলেও আকাশে এখনো অনেক আলো বাকি আছে অরিন্দম দা। গোধূলির রঙ তো দিনের সবচেয়ে সুন্দর রঙ।"

সেদিন আর কোনো বাধা ছিল না, ছিল না কোনো সামাজিক ভয়ের বেড়াজাল। সন্তানেরা নিজেরাই এগিয়ে এসে দুই পরিবারের সমস্ত অভিমান ভেঙে দিয়েছিল। ঋত্বিক আর অনিরুদ্ধর উদ্যোগেই এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে, নিকটাত্মীয়দের উপস্থিতিতে অরিন্দম আর মৈত্রেয়ী আইনি মতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

আজ অরিন্দমের চারতলার সেই ফ্ল্যাটটিতে আবার প্রাণ ফিরে এসেছে। বারান্দায় এখন দুটি ইজিচেয়ার পাতা থাকে। সকালে একসাথে চা খাওয়া, পুরনো দিনের গান শোনা, আর বিকেলে হাত ধরে হাঁটতে বেরোনো–জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তারা খুঁজে পেয়েছেন এক অনাবিল সুখ। দীর্ঘ অপেক্ষা আর ত্যাগের পর তাদের ভালোবাসা আজ পূর্ণতা পেয়েছে, ঠিক যেমন দীর্ঘ খরার পর প্রকৃতিতে নেমে আসে প্রশান্তির বৃষ্টি।